কৃষির রূপান্তর, কৃষকের অর্থনীতি ও নৈতিকতার প্রশ্ন ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

এম. এ. সাত্তার মন্ডল
ইমেরিটাস প্রফেসর
কৃষি অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
ময়মনসিংহ

প্লেনারি বক্তৃতা

২০তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলন, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
ঢাকা: ২১-২৩ ডিসেম্বর, ২০১৭

স্থান: ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ, কাকরাইল, ঢাকা

১.০

বাংলাদেশে কৃষির বৈচিত্রায়ন, দ্রুত প্রবৃদ্ধি ও খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, দারিদ্র্য হ্রাস ও ক্ষুধা নিরসন এবং গ্রামীন আয় বৃদ্ধি - এসবই এখন বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনায় বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। এর পেছনে কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রসারণ অনন্য অবদান রেখেছে এবং সেই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াও সবিশেষ ভুমিকা পালন করেছে। কৃষি রূপান্তরের সূচকগুলো নানাভাবে দৃশ্যমান হয়ে উঠলেও এই পরিবর্তনের নিয়ামকগুলোর ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও অর্থনৈতিক দিকগুলো দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতে অতটা পরিস্ফুট বা আলোচিত হয়নি। এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও খন্ডায়িত খামার বিশিষ্ট পরিমন্ডলে নতুন নতুন লাভজনক প্রযুক্তি ব্যবহার ও উৎপাদন বিকাশের পটভূমি বৃহত্তর ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতে উপস্থাপন করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। এখানে জোরালোভাবে বলা হয়েছে, কৃষি উৎপাদন ও গ্রামোন্নয়নে যে বিরাট প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে তার জন্য বাংলাদেশ সবুজ বিপ্লবের একমাত্র পথ হিসেবে ভর্তুকি ও বৃহদাকার যান্ত্রিকায়ন নির্ভর পাঞ্জাবী মডেল গ্রহণ করেনি। না নীতি প্রণয়নে, না কৃষি প্রযুক্তি কৌশল নির্ধারনে। বাংলাদেশ কিঞ্চিত ভর্তুকি সহায়তা দিয়ে বেসরকারি খাতের মাধ্যমে ক্ষুদ্র কৃষকের চাহিদা ও প্রয়োজন মাফিক সুলভ ও চলনসই কৃষি প্রযুক্তি প্রসারণের পথ বেছে নিয়েছে। এটিই হচ্ছে বাংলাদেশের অনন্য বৈশিষ্ট্য; যা খামারের ব্যবস্থাপনাগত আকার বৃদ্ধি, কৃষি শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি, কৃষি উপকরণ ও যন্ত্রপাতির দাম ওঠানামা, প্রাকৃতিক আবহাওয়া পরিবর্তন ও কৃষি পণ্যের বাজারমূল্যের হ্রাসবৃদ্ধির প্রেক্ষিতে পরিবর্তনযোগ্য।

২.০

বাংলাদেশের অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করার আগে কৃষির ওপর একটু আলোকপাত করা যাক। এখানে দেড় কোটির বেশি কৃষক পরিবার। সবাই ক্ষুদ্র কৃষক, যাদের গড় খামার আয়তন এক একরের মত। এদের ৮৫ ভাগের আবাদী জমির পরিমাণ এক একরের নিচে। কৃষিতে মোট কর্ম-সংস্থান কিছুটা বাড়লেও পুরুষ শ্রমিকের কর্ম-সংস্থান কমেছে; কিন্তু মহিলা শ্রমিকের কর্ম-সংস্থান বেড়েছে বেশ কয়েকগুণ। অ-কৃষি খাতে কর্ম-সংস্থান বেড়েছে মহিলা পুরুষ উভয়ের। কৃষি থেকে অ-কৃষি খাতে আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে দ্রুত গতিতে। এটি কৃষির বাণিজ্যিকরণ ও

বিনিয়োগ বৃদ্ধি সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ধারণাটি কেবল বাংলাদেশ নয়, সমগ্র এশিয়ার দেশগুলোতেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কৃষি শ্রমিকের অভাবজনিত কারণে দ্রুত যন্ত্রের ব্যবহার বাড়ছে। সেই সঙ্গে কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষি কর্মের সময়, পরিশ্রম ও ব্যয় সাশ্রয় করে দক্ষতা বৃদ্ধি করছে এবং ফসলের নিবিড়তা বাড়াতেও সাহায্য করছে। এবার কৃষি পরিবর্তনের অন্তর্নিহিত নিয়ামকগুলোর কথায় আসি।

৩.০ রাজনৈতিক ইতিহাস

১৯৭১ সালের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ সমগ্র জাতিকে একতাবদ্ধ করে। স্বাধীনতা লাভের পর প্রচন্ড খাদ্য ঘাটতি, ক্ষুধা ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তির লক্ষ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ডাক, দেশের প্রথম পরিকল্পনা কমিশন গঠন, ছাত্র শিক্ষক সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তাদের গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ার আহবান - এসবই কৃষি উন্নয়ন ও গ্রামোন্নয়নের প্রতি দৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকারের প্রমান। ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মাফ, আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, সহজলভ্য কৃষি ঋণ ও ভর্তুকিমূল্যে ব্যয় সাপেক্ষ সেচ ও যন্ত্রপাতি বিতরণ কৃষি উন্নয়ন নীতি আলোচনায় মূখ্য বিষয় হয়ে ওঠে। প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায়, বিশেষ করে **১৯৭০** এর জলোচ্ছ্বাসে গবাদি পশুর ক্ষয়ক্ষতির প্রেক্ষিতে ট্রাক্টর ও টিলার বিতরণ ও এসব যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষনের ব্যবস্থা রাখা হয়। এলক্ষ্যে কৃষি বিভাগ ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি প্রকৌশল বিভাগকে যুক্ত হওয়ার আহবান জানানো হয়। স্থানীয় পর্যায়ে কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরি করার ওপরও জোর দেয়া হয়। এজন্যে প্রথম পরিকল্পনায় অপ্রতুল সম্পদ প্রাপ্যতা সত্বেও এক কোটি টাকা বিশেষ বরাদ্দের ব্যবস্থা রাখা হয়।

৪.০ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি ক্ষমতা

বাংলাদেশের শিল্পায়নের সঙ্গে চট্টগ্রাম বন্দর, সৈয়দপুর রেলওয়ে প্রকৌশল ওয়ার্কশপ, পাটশিল্পের বিকাশ - এসবের দীর্ঘ সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন গ্রাম পর্যায়ে পাওয়ার পাম্প ও গভীর নলকূপের মাধ্যমে ইরি ধানের আবাদের জন্যে সেচ সুবিধার ব্যবস্থা করেছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কৃষি যন্ত্রপাতি টেষ্টিং ও স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন কমিটির মাধ্যমে ইঞ্জিন টেষ্টিং বেড স্থাপন করে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি প্রকৌশল অনুষদ এর সঙ্গে যুক্ত হয় এবং সেই সময়ে জাপান থেকে আমদানীকৃত ইয়ামাহা কুবোতা

ইঞ্জিন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সার্টিফিকেশনের কাজ করতো। পরে আশির দশকের শেষে বৃহত্তর পরিসরে কৃষিতে বেসরকারি খাতের অংশ গ্রহণের স্বার্থে স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন উঠিয়ে নেয়ার পর সুলভ চাইনিজ ইঞ্জিন গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। মজার বিষয় হলো, এটা কোন বড় চাইনিজ প্রকল্পের অংশ হিসেবে বা স্থানীয় সরকারের কোন বিশেষ উদ্যোগে ঘটেনি। এটা সম্পূর্ণভাবে সরকারের বেসরকারিকরণ নীতি সমর্থন ও বেসরকারি আমদানীকারকদের ব্যবসায়ী উৎসাহে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ দ্রুত প্রসার লাভ করে। এ প্রসঙ্গে সরকারের আরও কিছু যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত যেমন সেচ নলকূপের মধ্যেকার দূরত্ব ও ইঞ্জিন ব্রান্ড সম্পর্কিত আইন বাতিল, আমদানী শুল্ক উঠিয়ে নেয়া, সহজ শর্তে কৃষি ঋণ বিতরণ ইত্যাদি বেসরকারি খাতের অংশ গ্রহণকে উৎসাহিত করে। স্থানীয় ভাবে প্রথমে মিলনার্স কোম্পানী ও পরে বগুড়া হাব থেকে প্রস্তুতকৃত পাম্প সেচ কার্যক্রম প্রসারে বিশাল ভূমিকা রাখে। এ ছাড়াও অনেক সাহায্য সংস্থা ও এনজিও ক্ষুদ্র হস্তচালিত সেচ প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রসারিত করে, যা দরিদ্র কৃষকদের উফশী ধান উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য সহায়তা দান করে। এর সঙ্গে বেসরকারি খাতে গড়ে ওঠা যন্ত্র প্রশিক্ষণ সুবিধাগুলো গ্রামীণ মেকানিক তৈরি ও স্থানীয় পর্যায়ে ফাউন্ড্রি ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ গড়ে উঠতে সাহায্য করে।

৫.০ পানি মাটি আবহাওয়া

বিশাল জনবহুল দেশের ক্রমবর্ধমান খাদ্য চাহিদা এমনিতেই অভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রযুক্তিগত তাগিদ অব্যাহত রেখেছে। এর সঙ্গে সহায়ক হয়েছে দেশের উর্বর মাটি, মৌসুমি বৃষ্টিপাত, পানির প্রাপ্যতা, কৃষিতাত্ত্বিক জ্ঞানের সমাহার ইত্যাদি বিভিন্ন কৃষি- আবহ অঞ্চলে উফশী ধান ও গমের আবাদ বৃদ্ধিতে সহায়ক ভুমিকা রেখেছে। যেহেতু দেশটি নদীমাতৃক, সুলভে প্রাপ্য ক্ষুদ্র ইঞ্জিন নৌ-পরিবহন সুবিধা বৃদ্ধি করেছে। পরবর্তীকালে গ্রামীণ সড়ক ব্যবস্থার বিস্তৃতির ফলে ক্ষুদ্র ইঞ্জিন সড়ক পরিবহনেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে।

৬.০ কৃষি শিক্ষা ও গবেষণা

বাংলাদেশের কৃষির রূপান্তর ও গ্রামোন্নয়নে উচ্চতর কৃষি শিক্ষা ও গবেষণার ভূমিকা অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিসরে আলোচনা হয় ও প্রায়ই সঠিক প্রেক্ষিতে উপস্থাপিত হয় না। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কৃষি সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে

ডিগ্রীপ্রাপ্ত গ্রাজুয়েটগণ সরাসরি কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ কাজে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি কৃষি ব্যবসা যেমন সার, বীজ, সেচ, যন্ত্রপাতি, কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি কর্মকান্ডে যুক্ত হয়েছে। এশিয়ার অন্যান্য দেশে কৃষি শিক্ষার প্রতি উৎসাহ কমে গেলেও বাংলাদেশে এখনও উচ্চতর কৃষি শিক্ষার আবেদন কমেনি; বরং কৃষির বাণিজ্যিকায়ন প্রসার লাভ করার সাথে সাথে কৃষি একটি লাভজনক পেশা হিসেবে এর প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটাও বাংলাদেশের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য।

কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন বাংলাদেশ ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষনা প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ প্রাণী সম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানসহ প্রায় দেড় ডজন কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নিরন্তর গবেষণা কৃষি উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তরে বিশাল ভূমিকা রাখছে। স্বাধীনতার প্রথম দিকে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা কৃষি ও গ্রামোন্নয়নের প্রতি বাংলাদেশের অঙ্গীকার ও দৃঢ় প্রত্যয় প্রমাণ করে।

৭.০ বৃহত্তর শিক্ষাজাগতিক উদ্যোগ

বাংলাদেশের উন্নয়ন, বিশেষ করে কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন প্রচেষ্টা গোড়া থেকেই স্পন্দমান একাডেমিক আলোচনা ও বিতর্কের সুযোগ পেয়েছে। অসংখ্য গবেষণা, মাঠ পর্যায়ের জরিপ, সেমিনার, ওয়ার্কশপের মাধ্যমে উন্নয়ন কৌশল ও নীতিমালা পরিপক্কতার দিকে এগিয়েছে। ১৯৭০ এর দশকে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে স্বনির্ভর কর্মসূচী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে স্থানীয় উদ্যোগে উন্নয়ন এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে সমবায় খামার বিষয়ে গ্রামভিত্তিক গবেষণা পরিচালনা করে। এগুলোর উদ্দেশ্য ছিল কৃষি ও গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন কাজে প্রয়োজনীয় তথ্য ও বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই পরিকল্পনা কমিশনকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর প্রথম বারের মত মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে ভূমিহীনতা ও বর্গা প্রথার ওপর প্রতিবেদন প্রণয়ন করে। বিশ্ববিদ্যালয়, পেশাজীবী সংগঠন গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো উন্নয়ন বিতর্ক, আলোচনা ও মতামত প্রদান অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা প্রকাশনার মাধ্যমে অবদান রেখেছে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ৬২ গ্রাম জরিপ, যা

মাহাবুব হোসেন শুরু করেছিলেন, কৃষি, গ্রাম ও সামাজিক পরিবর্তনগুলো অনুধাবন করতে যথেষ্ট অবদান রেখেছে। ধানসহ অন্যান্য ফসলের উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন, আধুনিক চাষ পদ্ধতি, উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার মৎস্য চাষ ও প্রাণী সম্পদ ইত্যাদি বিষয়ে অসংখ্য গবেষণা ও প্রকাশিত জার্নাল, প্রবন্ধ, কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন সম্পর্কে পরিকল্পনা, বাজেট বরাদ্দ ও পরিবীক্ষণ কাজে সহায়ক হয়েছে। এ কথা মনে রাখতে হবে যে বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠার মাত্র এক বছরের মধ্যে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত দেশের সেরা অর্থনীতিবিদ ও পেশাজীবীদের নিয়ে প্রথম পরিকল্পনা কমিশন গঠন করা হয়েছিল। এটাও বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্য যে শুরু থেকেই উন্নয়ন পরিকল্পনায় বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে এবং সময়ের সাথে সাথে প্রয়োজনের নিরিখে নীতি-কৌশল পরিবর্তন করা হয়েছে। এটা বাংলাদেশের এক ইতিবাচক অন্তর্নিহিত শক্তি।

৮.০ অবকাঠামো, যোগাযোগ ও শক্তি

সুবিস্তৃত সড়ক নেটওয়ার্ক ও ডিজিটাল যোগাযোগ ব্যবস্থা গ্রামীণ যান্ত্রিকায়ন, পরিবহণ, কৃষি যন্ত্রপাতির স্থানান্তর সহজতর ও ব্যয় সাশ্রয়ী করেছে। এ জন্যে গ্রামীণ উদ্যোক্তাগণ কৃষি যন্ত্রপাতির ওপর বিনিয়োগ বাড়াচ্ছে এবং স্থানীয় পর্যায়ের অবস্থার আলোকে নানা রকমের ভাড়া ও চুক্তি ব্যবস্থার উদ্ভাবন করেছে। এতে একদিকে গ্রামাঞ্চলে যন্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অপর দিকে এগুলোর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে কর্ম-সংস্থান বাড়ছে।

বাংলাদেশের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাসের সম্ভার, যা ইউরিয়া সার ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রধান উৎস। বাংলাদেশ প্রথমেই দুটো সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একটি হচ্ছে প্রাপ্তব্য গ্যাস রপ্তানি না করে দেশের শিল্পায়ন, পরিবহন ও কৃষি উন্নয়ন কাজে ব্যবহার করা; এবং অপরটি হচ্ছে 'চয়েস অব টেক্‌নিক' যার মাধ্যমে সেচ পাম্প, ট্রাক্টর, থ্রেসার মেশিন ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি চালনায় ডিজেল ফুয়েল এর ব্যবহার। এখন অবশ্য কৃষিতে বিদ্যুৎ ও নবায়নযোগ্য সৌরশক্তির ব্যবহারকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

৯.০ কৃষকের অর্থনীতি ও নৈতিকতার প্রশ্ন

বাংলাদেশের কৃষির বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে খোরপোস কৃষি থেকে বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তর। ক্ষুদ্র কৃষকও এখন বাজারের কথা মাথায় রেখে কৃষি পণ্য উৎপাদন

করে। কৃষি শ্রমিকের ঘাটতির ফলে গ্রামাঞ্চলেও শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ফলে উৎপাদন খরচ বেড়ে গিয়ে কৃষকের মুনাফা হ্রাস পাচ্ছে। কৃষি ও শিল্পের বিনিময় হার কৃষির বিপক্ষে। এ অবস্থায়, কৃষি কাজে যন্ত্রের ব্যবহার বাড়ছে। দেশে বর্তমানে ৩৫ হাজার ট্রাক্টর, ৭ লক্ষ পাওয়ার টিলার, ৪ লক্ষ শক্তিচালিত থ্রেসার, ১৫ লক্ষ অগভীর নলকূপ, ২ লক্ষ পাওয়ার পাম্প, ৩৫ হাজার গভীর নলকূপ চলছে। সর্বশেষ সংযোজন ধানের চারা রোপণ যন্ত্র, রিপার ও কম্বাইন্ড হার্ভেষ্টার, যার সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। এর ফলে বাড়ছে উৎপাদন। চালের উৎপাদন এখন স্বাধীনতার সময়কাল থেকে প্রায় চারগুণ বেড়েছে। খাদ্যশস্য, গম, ভুট্টা, শাকসব্জির উৎপাদনে প্রায় স্বয়ং সম্পূর্ণ। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগে এটা কিছুটা ওঠানামা করে, এটা স্বাভাবিক।

প্রশ্ন হচ্ছে কৃষকের লাভটা কতটুকু এবং তা কতখানি টেকসই করা যায়। উত্তরটা জটিল এবং চিরচেনা। এ বছর কোন ফসলে ভালো লাভের মুখ দেখলো তো পরের বছরই ক্ষতি। তবে ঐ বছরেই হয়ত অন্য আরেক ফসলের দাম ভালো, কৃষকের মুখে হাসি। যেমন, এই মৌসুমেই আলু-মুলায় মুখ কালো, ফুল কপিতে হাসি। এটাকে অনেকে 'কবওয়েব থিওরি' দিয়ে মৌসুম নির্ভর কৃষি পণ্যের যোগান ও চাহিদার ভারসাম্যহীন অবস্থায় দামের ওঠানামা ব্যাখ্যা করেন। বড় দাগে দেখলে এটা মেনে নেয়া যায়, অবশ্য যদি বাজারের সকল খেলোয়াড় নিয়ম মেনে চলতো। তা তো চলেনা। কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যাক।

প্রথমঃ ধানের কথা ধরা যাক। ভরা মৌসুমে দাম পড়ে যায়, গরীব চাষীর যখন তখন বিক্রি করা দরকার। সরকার সংগ্রহমূল্য ঘোষণা করে প্রায়শ দেরিতে, তাও আবার বাজার মূল্যের চেয়ে খুব বেশি নয়। সংগ্রহ কেন্দ্রের ঝক্কি ঝামেলা তো আছেই। ভেজা ধান, অল্প পরিমাণ, চিটা ধান নানা কারণে সংগ্রহ মূল্যের সুবিধা কৃষক পায়না। ফড়িয়া বেপারি ও চালকল মালিকদের পোয়াবারো। এখানে অনৈতিকতার দায় কার? নিশ্চয়ই কৃষকের নয়। এ বছর অবশ্য ধান চালের দাম ভালো, আমনে লাভ হয়েছে। আশা করা যায়, এ দাম টিকে থাকলে বোরো চাষে কৃষকের উৎসাহ থাকবে অর্থনৈতিক যৌক্তিক কারণেই।

দ্বিতীয়ঃ উদাহরণটি বেশ অস্বস্তিকর। সেটা হচ্ছে এবারের আলু। দাম একেবারে পড়ে গেছে। আলু চাষী কোল্ড স্টোরেজ থেকে আলু বের করছেনা, খরচ উঠছেনা বলে। নতুন আলু উঠে আসবে শীঘ্রই। তারা পড়েছে গ্যাড়া কলে, না পারছে গুদাম খালি করতে, না পারছে নতুন আলু রাখার জায়গা করতে। এখানে নীতি

নৈতিকতার প্রশ্নটি অজ্ঞাত। সবাই দোষ দিচ্ছে চাহিদার চেয়ে বেশি উৎপাদনকে। আমাদের লাগে বছরে ৬০ লক্ষ টনের মত, রপ্তানি হয় ৪০ লক্ষ টনের মত। বাড়তি উৎপাদন নাকি ২০ লক্ষ টন। রপ্তানি নাকি আশানুরূপ হয়নি এবার। আমি মনে করি অনৈতিক যদি কিছু থেকে থাকে তা আলু চাষির নয়। এই তো ২০১৪ সালের কথা। নতুন আলুর পরিবর্তে ব্যকটেরিয়াল উইল্ট আক্রান্ত পুরানো আলুর কনসাইনমেন্ট রাশিয়া ফেরত পাঠায়। সেই থেকে ঐ দেশে আলুর রপ্তানি বন্ধ হয়ে যায়। ২০ শতাংশ রপ্তানি বোনাস নেয়ার পর এই অপকর্মটি অনৈতিকতার উদাহরণ। আর যেহেতু বেশি উৎপাদন হবে টের পাওয়া যাচ্ছিল, আগে থেকেই আলু কোন খাদ্য বিতরণ কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ হয়তঃ ছিল। কৃষকের অর্থনীতি বেশ ভঙ্গুর ও ঝুঁকিপূর্ণ।

তৃতীয়ঃ উদাহরণটি এবারের আমের। কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী ও রপ্তানিকারকদের নিয়মিত পরামর্শ ও উৎসাহে চাঁপাইয়ের আম বাগানীরা আমের সুষ্ঠু পরিচর্যা থেকে শুরু করে বিজ্ঞানসম্মত ব্যাগিং পদ্ধতি ব্যবহার করেছে গাটের পয়সা খরচ করে। শেষ পর্যন্ত কী হলো। আমাদের প্লান্ট কোয়ারেন্টাইন বিভাগ থেকে ছাড়পত্র মিললো না হয়তঃ যৌক্তিক কারণে। প্রধান আমদানীকারক ওয়ালমার্ট বাংলাদেশ থেকে আম নিতে অস্বীকার করলো। মার খেলো আমচাষী। এখানে কোন অনৈতিকতার প্রশ্ন আছে কিনা জানা নেই। তবে দাম কম থাকায় এবার পেট ভরে ল্যাংড়া, খিরসা পাতা, গোপালভোগ আম খেতে পেরেছে সাধারণ ভোক্তারা। কখনও কখনও অযৌক্তিক কাজও যে অনেকের সুবিধা বয়ে আনে এটা তার প্রমাণ। রিচার্ড থ্যালার তো এবার অর্থনীতিতে নোবেলই পেলেন মানব আচরণের যৌক্তিক অযৌক্তিকতা বিশ্লেষণের জন্যে।

চতুর্থঃ সীড কোম্পানীগুলোও কি কম যান মাঝে মধ্যে? শাকসব্জি এমন কি হাইব্রিড ধানের বীজ সরবরাহেও কৃষকের প্রতারিত হওয়ার খবর পাওয়া যায়। কৃষককে সময়মত সঠিক জাত ও সঠিক মানের বীজ সরবরাহ না করে বীজ ব্যবসায়ীগণ অনৈতিকতার আশ্রয় নেয়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় কৃষক। আসলে জিরো সাম গেইম। পরিণামে দেশের সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হই।

পঞ্চমঃ কৃষি ঋণের মামলা। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক মিলে ১ লক্ষ ৮০ হাজার কৃষকের বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট কেস করেছে গড়ে ৫০০০ টাকা ঋণ অনাদায়ের দায়ে। ১২,২৯২ জন কৃষকের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট ইস্যু করা হয়েছে। মোট খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৫৬২ কোটি টাকা। অথচ জনতা

ব্যাংকের খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৪২০০ কোটি টাকা। মাত্র ছয় মাসে খেলাপির পরিমাণ বেড়েছে ১১০০ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে কোন ঋণ খেলাপির বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট বের হয়েছে কিনা জানা নেই। অথচ তিনটিই রাষ্ট্রীয় ব্যাংক। প্রথম দুটো গ্রামে গঞ্জের কৃষকদের ব্যাংক, দ্বিতীয়টি ২য় বৃহৎ রাষ্ট্রীয় ব্যাংক, ঋণ খেলাপিরা শহুরে রাঘব বোয়াল। এরা ধরা ছোঁয়ার বাইরে, অথচ অন্যটির অসহায় গ্রাহকরা মামলা হয়রানির শিকার। এটা তো কেবল অনৈতিক আচরণ নয়, বাণিজ্যিক কৃষি বিকাশের পথে প্রধান অন্তরায়ও বটে।

সবশেষে, কৃষকের নিজেদের কিছু কিছু ক্ষেত্রে নৈতিকতার অভাব দেখা যায়। উদাহরণটা শাকসব্জি ফলমূলে কীটনাশকের ব্যবহার। শোনা যায়, কৃষক তার নিজের খাবার জন্যে অল্প কিছু জমিতে যে সব্জি করে, তাতে কীটনাশক ছিটায়না। কিন্তু, যেটা বাজারে বিক্রির জন্যে বেশি পরিমাণে করে সেটায় ঔষধ ছিটায় ঠিকই, প্রায়শঃ অনুমোদিত পরিমাণের চেয়ে বেশি এবং বাজারে নেয়ার মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে। এখানে কৃষকের অনৈতিক কাজটির জন্যে নাকি পেষ্টিসাইড কোম্পানীগুলোর সেল্‌স এজেন্টরা দায়ী। বেশি বেশি কমিশনের লোভে নাকি কৃষকদের অধিক পরিমাণে এবং কখনও কখনও অপ্রয়োজনীয় ঔষধ ছিটানোর পরামর্শ ও প্রয়োজনে বাকিতে বিক্রির ব্যবস্থাও করা হয়। মজার ব্যাপার হলো সেল্‌স এজেন্টদের এহেন আচরণ যৌক্তিক, কেননা তারা তাদের কমিশন সর্বোচ্চ মাত্রায় নিতে চায়। কিন্তু কাজটি অনৈতিক, কারণ এটা কীটনাশক ব্যবহার নীতিমালা বিরোধী এবং জনস্বাস্থের জন্যে হুমকি স্বরূপ।

পরিশেষে, প্রযুক্তি ব্যবহার, উৎপাদন বৃদ্ধি ও নীতি নৈতিকতার বিষয়টি স্থান, কাল, পাত্র ভেদে বিচার্য। তবে, সঠিক নীতি সঠিক সময়ে প্রয়োগ এবং কর্মভেদে পুরষ্কার অথবা তিরষ্কার এর ব্যবস্থা অতি প্রয়োজনীয়। একেই তো আমরা সুশাসন বলি। অর্থনীতি চর্চার সকল তত্ত্বই সুশাসনকে ধ্রুব বলে ধরে নেয়।